ইতিহাস ও সাহিত্য

পবিত্র সরকার

ভূমিকা

যখন দুটি বিষয়কে এভাবে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করার প্রশ্ন ওঠে, তখন স্বাভাবিকভাবে দুয়ের তুলনার কথাটাই আগে মনে আসে। কোথায় এ দুয়ের মিল আছে বা দুয়ের মধ্যে পরস্পর-অনুসৃত বা overlapping এলাকা আছে, আবার কোথায় মিল নেই, এমনকি বিরোধ বা বৈচিত্র্য আছে — তা অনুসন্ধান করবার কথাই প্রাথমিকভাবে মনে হয়। অবশ্যই এ এক সংগত অনুসন্ধান — কারণ, উত্তর-আধুনিক যুগে না হলেও তার পূর্ববর্তী[১] আধুনিক যুগে বিদ্যা ও শিল্পকলার সংরূপ বা genre হিসেবে স্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণের একটা আগ্রহ জেগে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভাগীয় বিভাজনের প্রয়োজনে কিছুটা, কিছুটা বা হয়তো জ্ঞানচর্চার এলাকাকে আরও সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজনে — এই পার্থক্য প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। পৃথক হলেই তুলনার প্রশ্ন ওঠে, কিন্তু ধরেই নেওয়া হয় যে, সে পার্থক্য লুইস ক্যারলের cabbages and kings-এর মতো দুস্তর হবে না সে রকম ক্ষেত্রে তুলনার দুঃসাহস দেখানোর মতো লোক বেশি না-হওয়াই সম্ভব। অর্থাৎ তুলনার ক্ষেত্রে বিষয় দুটির কিছুটা নৈকট্য থাকা দরকার — সমতা, পার্থক্য, উভয়ের মধ্যে বণ্টিত এবং অবণ্টিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

এই তুলনার প্রকল্পকে আমরা বলতে পারি একটি অনুভূমিক (horizontal) প্রকল্প। দুটি বিষয় পাশাপাশি ফেলে আমরা দুয়ের অংশ, ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা, প্রকরণ, প্রকাশ ইত্যাদিকে লক্ষ্য করি, এবং তাদের মধ্যে মিল ও তফাত, সান্নিধ্য ও দূরত্ব দেখাই। এখানে 'সময়' নামক মাত্রাটিকে আমরা উপেক্ষা করি। আমরা এমন ভাব করি যেন ইতিহাস ও সাহিত্য — এ দুটি বিষয় পৌরাণিক উর্বশীর মতো একেবারে প্রথম থেকেই প্রস্তুত ও পূর্ণাঙ্গ চেহারা নিয়ে আছে, তাদের কোনো বিবর্তন ঘটেনি, নানা সময়ে তাদের সম্পর্কের কোনো হেরফের ঘটেনি। অবশ্যই আমাদের এই ভাবনা ন্যায্য ও যথার্থ নয়। সাহিত্য ও ইতিহাসের ঐতিহাসিক সম্পর্ক (ভাষাবিজ্ঞানে

[illegible] স্মারক বক্তৃতা (২০০৮)। প্রথম প্রকাশ ২০০৮।

ফের্দিনাঁ দ সোস্যুর যাকে diachrony বলেন তাতে উদ্ভূত সম্পর্ক) না দেখলে এ দুয়ের সাদৃশ্য ও পার্থক্যের 'কারণ' বা পটভূমিকা কী ছিল তা বোঝা দুষ্কর হবে। তার ফলে দুটি বিষয়কে সর্বাঙ্গীণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। ফলে সময়ের সূত্র ধরে তাদের মধ্যে যে উল্লম্ব বা vertical চেহারা ছিল তাও আমাদের বুঝে নিতে হবে। শুধু একাবস্থ (synchronic) তুলনা নয়, বিবর্তনগত সম্পর্কও আমাদের বিবেচনার বিষয়। অর্থাৎ এখানে 'সময়' উপাদানটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটা আরিস্তোত্‌ল থেকে আরম্ভ করে টয়েনবি পর্যন্ত অনেকেই করেছেন, এ বিষয়ে আমাদের অতি-সংকীর্ণ পড়াশোনার বাইরে নিশ্চয়ই আরও বহু সূত্র আছে। দ্বিতীয় বিবেচনাও ইতস্তত দেখেছি, কিন্তু খুব সংহতভাবে পাইনি। আমরা দ্বিতীয় বিবেচনাটি দিয়ে আগে শুরু করব।

ইতিহাস ও সাহিত্য : ঐতিহাসিক সম্পর্ক

শতাব্দীধারার দিকে পিছনে ফিরে তাকালে সহজেই চোখে পড়ে একটা সময় সাহিত্য আর ইতিহাসের মধ্যে এই সীমানা ভাগ বা দূরত্ব ছিল না। ইতিহাস সাহিত্যের সন্তান, এমন কথায় যদি আজকের ঐতিহাসিক অস্বস্তি বোধ করেন তাঁকে অপরাধী করার কারণ নেই, কারণ নিজের বিষয়ের স্ব-তন্ত্রতা বা autonomy আমাদের ধারণায় অনেকদিন নিহিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের প্রথম ইতিহাস রচনা যে মানুষের সাহিত্য রচনাও — তা যে মৌখিকতার যুগ থেকে লিপির যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে তা অস্বীকার করার কিছু নেই। মিথ বা লোকপুরাণ হোক, বা বাইবেল-এর মতো বা হিন্দু পুরাণগুলির মতো শাস্ত্রীয় পুরাণ, কিংবা রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ওডিসি গিলগামেশ কালাভেলার মতো মহাকাব্য বা কাব্যিক পুরাণ একই সঙ্গে কাব্য এবং ইতিহাস। অবশ্যই বহুলাংশে কল্পিত আখ্যান — কিন্তু সে তো হেরোদোতাসের রচিত ইতিহাস, কিংবা থুকিদিদেসের পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাস সম্বন্ধেও বলা চলে। যদিও থুকিদিদেস হেরোদোতাসের চেয়ে ঐতিহাসিক হিসেবে অনেক তথ্যনিষ্ঠ, কিন্তু তাঁর রচনাতেও ভারত সম্বন্ধে নানা অলীক অতিরঞ্জন আছে, সেগুলি অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর বইটিতে চমৎকার তালিকাবদ্ধ করেছেন (ত্রিপাঠী, ১৯৮৬ : ২)। তাঁরই সিদ্ধান্ত থেকে (ত্রিপাঠী, ১৯৮৬ : ২১) জানতে পারি যে, "মেকলের যুগ পর্যন্ত ইতিহাস সাহিত্যের অন্যতম শাখারূপে পরিগণিত হত। প্রধান ছিল রচনাশৈলী, বাচনভঙ্গী, বর্ণনা-কৌশল। ইতিহাসের উপাদান সন্ধান বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠেনি, গবেষণার পদ্ধতি ও বিচারের মানদণ্ড ছিল অজ্ঞাত।" উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যদি ইতিহাস এভাবে সাহিত্যের অঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে সাহিত্যের সঙ্গে তার জন্মসূত্রের যোগ বেশ দীর্ঘস্থায়ী ছিল বলতে হবে। ভারতীয় সংস্কারে পুরাণ ও ইতিহাস একই সৃজনকর্মের অন্তর্গত ছিল দীর্ঘদিন, ফলে অর্বাচীন নানা পুরাণে (বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য) পুরাণের যে সংজ্ঞা পাওয়া গেছে, সেই পরিচিত 'সর্গশ্চ

প্রতিসর্গশ্চ বংশ মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।' — তাতে সর্গ-প্রতিসর্গ যদি সংগঠন-ধর্মের নির্দেশ ধরি, বংশ, মন্বন্তর অর্থাৎ ব্যাপক পরিবর্তন, বংশানুচরিত ইত্যাদি ইতিহাসের এলাকায় এসে যায়। বস্তুতপক্ষে মিথ বা পুরাণে (সেই সঙ্গে পুরাণ-নির্ভর ভাস্কর্য, চিত্রকলা, উৎকীর্ণ শিলালিপির কবিতা, প্রকীর্ণ কবিতা এবং তা থেকে লোকজীবনের মৌখিক পরম্পরায় প্রবাহিত লোককথা, আখ্যান, গান, গাথা ইত্যাদিতে প্রাচীন সব সংস্কৃতিনায়ক ও বীরের যে বর্ণাঢ্য ও বিচিত্র প্রতিমূর্তি তৈরি হয়ে যায়, তাই থেকেই পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের নায়কদের ইতিহাস-সংগত এক সম্ভাব্য মূর্তি পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করেন। যেমন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর *কৃষ্ণচরিত্র*-তে, এতে কৃষ্ণের 'গোপীশতকেলিকার'—এ পরিচয়কে বর্জন করে, তাঁর সংকল্প— "...কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব।" (চট্টোপাধ্যায়/বাগল, ১৩৬১ : ৪০৬)। বা দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি তাঁর 'The Historical Krishna' প্রবন্ধে (দ্র. Chattopadhyay, 2002 : 403)। যেখানে তাঁর সিদ্ধান্ত —

"Krishna, then, is not a single historical figure, but compounded of many semilegendary heroes who helped in the formation of a new food-producing society."

ইউরোপে জিশুখ্রিষ্ট সম্বন্ধে এ রকম গবেষণা বহু শতাব্দী ধরেই চলেছে।

The Rise of the West-এ W. H. McNeill বলেছেন, In the beginning human history is a great darkness. (McNeill, 1963 : 19) বলা বাহুল্য, history কথাটির এই অপারিভাষিক প্রয়োগ তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক এবং পাথুরে-প্রমাণধারী ঐতিহাসিকের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। ইতিহাসের আগে থাকে প্রাগিতিহাস, তারও আগে হয়তো আদিম ও বর্বরযুগের বৃত্তান্ত — যা মূলত নৃবিজ্ঞানীর আলোচনার বস্তু। কিন্তু প্রাগিতিহাসে কখনও কখনও পুরাণ ও প্রত্নতত্ত্ব মিশে যায়, এবং পুরাণ বা লোকশ্রুতির পাথুরে প্রমাণও কখনও কখনও মিলে যায়। সুইস পুরাতত্ত্ববিদ Kerenyi এ দুয়ের তফাত করতে গিয়ে বলেন, An essential difference between the legends of heroes and mythology proper, between the myths a gods and those of the heroes, while one often entwined with them, or at least border upon them, consists in this : that the latter proves to be, whether more or less, interwoven with history, with the events, not of a primeaval time which lies outside time, but with historical time, and bordering on it as closely as if they were history proper and not mythology. (Kerenyi, 1960 : 1)। অর্থাৎ ঈশ্বর বা দেবদেবীরা story-র অংশ, ইতিহাসবদ্ধ বীরেরা history-র, কিন্তু

Scanned by CamScanner

দুয়ের মিশ্রণ ঘটতেই পারে — বহু ক্ষেত্রেই যা ঘটেছে। কুরুক্ষেত্রে সমুদ্রের তলায় দ্বারকার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে বলে শুনেছি — তা কতটা যথার্থ ইতিহাসবিদ বন্ধুরা তা বলতে পারেন। অন্যদিকে ক্রিট দ্বীপে খননকার্য চালিয়ে যে মিনোয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা গ্রিক পুরাণের কোনো কোনো আখ্যানের সূত্র হয়ে ছিল তা আমরা লক্ষ করি। থেসিউসের মিনোতর নামে গোলোকধাঁধার দৈত্যকে হত্যা এইরকম একটা আখ্যান। ফলে প্রত্নতত্ত্ব কখনও কখনও পুরাণ বা সাহিত্যের সূত্র থেকে ইতিহাস নির্মাণ করার চেষ্টা করে। তা অত্যন্ত ব্যাপক এক প্রয়াস।

অর্থাৎ সময়ের উদ্ভব ক্রম থেকে বিচার করে আমরা দেখি যে, ইতিহাস আর সাহিত্যের পার্থক্য এক সময় ছিলই না। সাহিত্য নিজে ইতিহাস নিজে — এই দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের চেয়েও অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল তাদের, ছিল একাত্মতা। তার পরে যখন দুটি বিদ্যাক্ষেত্র পৃথক হয়ে গেল তখন তাদের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। অমলেশ ত্রিপাঠী ইংল্যান্ডের ইতিহাস রচনার সংস্কৃতি বিচার করে ইতিহাস ও সাহিত্যের বিচ্ছেদের যে তারিখ দিয়েছেন তা সব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা সত্য নাও হতে পারে। কারণ আনুমানিক ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই আরিস্তোতল তাঁর কাব্যতত্ত্বের নবম অধ্যায়ে 'সত্য' প্রকাশের দিক থেকে কবিতা অর্থাৎ সাহিত্য ও ইতিহাসের একটা তুলনামূলক সিদ্ধান্ত দাঁড় করিয়েছিলেন, সেটা আমাদের মনে আছে। সেই তুলনার প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব।

যখন দুয়ের মোটামুটি একটা বিচ্ছেদ ঘটল, অর্থাৎ প্রত্যেক সংস্কৃতিতে এমন সময় এল যখন দু-পক্ষ নিজেদের উদ্দেশ্যের ভিন্নতা সম্বন্ধে একটা ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করল তখনও এই দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক শেষ হল না। ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য অতীতের ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি, সেটা তার বর্তমান ফাঁকফোকর পূর্ণ করেই হোক, আর নতুন অর্জিত বিষয় গ্রহণ করেই হোক, আর সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রধানত আনন্দদান — এই পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও, দুয়ের পথ সুনিশ্চিতভাবে দূরবর্তী এবং যোগসূত্রহীনভাবে পৃথক হয়ে গেল, এমন নয়। ইতিহাসের কাছ থেকেও সাহিত্য প্রচুর গ্রহণ করেছে এবং এখনও করেই চলেছে। শুধু মিথ বা পুরাণের মধ্যে নিহিত গোষ্ঠীগত স্মৃতিকল্পনার ইতিহাস নয়, গবেষণালব্ধ ইতিহাসের কাছেও সাহিত্য হাত পেতে চলেছে। সেটা মহাকাব্য গাথাকাব্য রচনাতেই হোক আর ঐতিহাসিক উপন্যাস আর নাটক রচনাতেই হোক। গ্রিসে আয়স্কুলস থেকে স্পেনে লোপে দ ভেগা, জার্মানিতে বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট বা রলফ্ হোকুথ, ফ্রান্সে জঁ আনুই, এবং ইংল্যান্ডে শেক্সপিয়ার ওয়াল্টার স্কট থেকে বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এমনকি রমাপদ চৌধুরী বিমল মিত্র পর্যন্ত তার বিবরণ দিতে গেলে বিপুল পরিসরের প্রয়োজন হবে।(২) অবশ্যই সাহিত্য ইতিহাস থেকে সর্বত্রই গ্রহণ করে, কখনও নির্বিচ্ছ যোগ্যতাবিরা দেখিয়ে ইতিহাসকে ধর্ষণও করে। মার্কিন বা ম্যাকিন

আমেরিকার ঔপন্যাসিকেরা আবার তখনকার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির জীবনের দুর্দান্ত নাটকীয়তার আকর্ষণে তাঁদের নিয়ে উপন্যাস লিখতে প্রলুব্ধ হন। যদিও টয়েনবি ইতিহাস বলতে মূলত 'সোসাইটি' বা বৃহৎ মানবসমাজের ইতিহাসকেই 'intelligible unit' হিসেবে স্বীকৃতি দেন (Toynbee, 1947 : 11) এবং নিজে একরকম চারটি বৃহৎ সমাজ-সভ্যতা ক্ষেত্র নির্দেশ করেন (P. 8), তবু ইতিহাসে যখন ব্যক্তি প্রাধান্য পান এবং পৃথক ভাবে তাঁর জীবনী ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে — তখন তাও সাহিত্য আত্মসাৎ করতে চেয়েছে, প্রথমে সন্তজীবনী বা hagiography হিসেবে, তারপরে কখনও খানিকটা কল্পজীবনী হিসেবে, যেমন আছে মোরোয়া-র লেখা শেলির জীবনী 'দি এরিয়েল', বা প্রমথনাথ বিশীর পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডির হক হয়ে সাজানো মাইকেল মধুসূদন। অবশ্যই ঐতিহাসিকেরা এ ধরনের প্রয়াসকে একটু সন্দেহের চোখে দেখেন, মুলার এগুলিকে, অর্থাৎ fictionalized biography-কে ইতিহাসের bastard offspring হিসেবে গণ্য করেছেন (Muller, 1954 : 37), কারণ তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, '... history must always aim at literal truth'। কিন্তু জীবন-উপন্যাসের লেখকেরা শুধু কেন, নাট্যকারেরাও এ ধরনের মন্তব্যে এ পর্যন্ত দমে যাননি এবং ভবিষ্যতেও দমে যাবেন বলে মনে হয় না। ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের নাড়ির যোগের কথা স্মরণ করেই তাঁরা হয়তো ইতিহাস থেকে বিনা চক্ষুলজ্জায় গ্রহণ করতেই থাকবেন।

অর্থাৎ সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক থাকছেই। এক সময় যদি সাহিত্য উত্তমর্ণের ভূমিকা নিয়েছে তো আজ সে মূলত অধমর্ণ, বিবর্তনের সূত্রে দুয়ের মিথস্ক্রিয়ার চরিত্র বদলেছে।

কিন্তু আরও দু-একজায়গায় ইতিহাসকে হয়তো এখনও সাহিত্যের কাছে হাত পাততে হয়। তা হল সাহিত্যের মৌখিক পরম্পরা বা oral tradition — লোকসংগীত, জনশ্রুতি, কিংবদন্তি, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া ইত্যাদি — যার মধ্যে অনেক সময় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক স্মৃতি ধরা থাকে। এই স্মৃতি ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান হয়ে ওঠে কোনো সমাজ বা ঘটনা বা ব্যক্তির কীর্তিকলাপের একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি করবার জন্য। তা সিপাহি বিদ্রোহই হোক, বাংলাভাষী অঞ্চলের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসই হোক, দীনেশচন্দ্র সেনের বাঙালীর ইতিহাস-এ চর্যাপদের ব্যাপক ব্যবহার স্মরণ করুন।

আর-একটা ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাহিত্যকে একটু স্বীকার করতে হয় — বলতে পারি সেটা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। এই প্রযুক্তি হল ভাষা। সাহিত্য নিজেকে প্রকাশ করে, যথাসম্ভব আকর্ষক ভাষায়, ওই আকর্ষক ভাষা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ আকর্ষণের অন্যতম উপাদান। প্রাক্তন চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ ভাষাবিজ্ঞান চক্রের যেমন ইয়াকবসন বা মুকারোভস্কি প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন, ওই সজ্জিত বা foregrounded ভাষাতেই সাহিত্য সাহিত্য হয়, নইলে তা অন্য কিছু হত। সাহিত্যের

ভাষা যদি করে 'আমাকেও লক্ষ করো, তবেই আমার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত বস্তু তোমার কাছে স্পষ্ট ও স্মরণযোগ্য হয়ে উঠবে — আমিই তার রক্ষাকর্তা'।

অবশ্যই ভাষার এই প্রমুখন বা foregrounding-এর নানা স্তর আছে। কবিতার ভাষা গদ্যের চেয়ে বেশি প্রমুখিত, আবার গদ্যভাষার প্রমুখনও লেখকের উপর নির্ভর করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্যের চেয়ে কমলকুমার মজুমদারের গদ্যের প্রমুখন অনেক বেশি। ঐতিহাসিক অবশ্যই সাহিত্যের গদ্য লেখকদের এই প্রমুখন-পরম্পরা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন না, কিন্তু তাঁর ভাষাতেও যাতে ইতিহাসের তথ্য সরস, সুবিন্যস্ত ও স্মরণযোগ্য হয়ে উঠে তার জন্য তাঁকে সাহিত্যের পাঠ অবশ্যই নিতে হবে। অর্থাৎ ইতিহাসের বিবৃতি ও ব্যাখ্যানের পক্ষে সংগত একটি শৈলী তাঁকে নির্বাচন ও গ্রহণ করতে হবে, সাহিত্যের নানা শৈলীর মধ্য থেকে। কী ধরনের শৈলী তিনি বর্জন করবেন সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রে তারও প্রদর্শনী তৈরি রাখে।

তুলনা

(ক) সময়ের অবয়ব

সময় নিয়েই দু'য়ের কাজ। বিজ্ঞানের সময় যদি স্থির হয়, নৃবিজ্ঞানের সময় হয়তো বৃত্তাকার। কিন্তু ইতিহাসের সময় প্রবহমান — অতীত থেকে বর্তমান ছুঁয়ে এগিয়ে চলে। ইতিহাসের উপজীব্য যদি চলে-যাওয়া সময় বা অতীত হয়, সাহিত্যের সময়ও এক হিসেবে অতীত বলেই ধরে নিতে পারি। যদিও ইতিহাসের অতীত সত্যভিত্তিক বা সত্য বলে গৃহীত, অন্যদিকে সাহিত্যের অতীত প্রধানত এক কল্পিত অতীত। এমনকি যে সব ঘটনা এখনও ঘটেনি (বা ঘটবে কি না সন্দেহ) — সেই কল্পবিজ্ঞানের গল্পও — ধরা যাক আইজাক আসিমভের *Pebbles in the Sky* যে ক্রিয়াপদের অতীত কালই ব্যবহার করছে তা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন।[৩] একে কখনও narrative past tense বলা হয়। এতে বোঝা যায় সর্বকালব্যাপ্ত ও সর্বদর্শী লেখক কল্পবিজ্ঞানের ভবিষ্যপুরাণ রচনা করতে গিয়ে সেই ভবিষ্যৎকেই পিছনে ফেলে, অর্থাৎ তাকে অতীত হিসেবে চিহ্নিত করে, একটা অবস্থান নেন, তাই ঘটনাটি ঘটে গেছে বলেই আমাদের বোঝাতে চান — নইলে তিনি গল্পের উপসংহারটা জানলেন কী করে?

অবশ্যই সময়ের এই মাত্রাকে ঔপন্যাসিক বা গল্পকার কতটা ঘনত্ব বা বিস্তার দেবেন তা তাঁর উপর নির্ভর করবে। এখানে আমরা অশীন দাশগুপ্তের (দাশগুপ্ত, ১৯৮৯) 'বড়ো সময়' 'ছোটো সময়'-এর কথা বলছি না। সে দুটি যথাক্রমে ইতিহাসের বৃহৎ ঘটনা আর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যুক্ত। আমরা বলছি সময়ের ছোটো পরিসরকে ঘনত্ব দেওয়ার কথা — যা জেম্‌স জয়েস তাঁর *ইউলিসিস* উপন্যাসে বা বাঙালি গোপাল হালদার তাঁর *ত্রিদিবা* (*একদা, অন্যদিন, আর-এক দিন*) নামে

ত্রয়ী উপন্যাসে দিয়েছেন। সময়কে এমন ঘনত্ব দিতে হলেই অজস্র অনুপুঙ্খ তার সঙ্গে জুড়ে যায়, স্মৃতি ও চেতনার প্রবাহ ধরে অসংলগ্নভাবে আগের ঘটনা পরে আসে, পরের ঘটনা আগে যায়, ঘটনার নানা ধরনের মন্তাজ (montage) ঘটিয়ে আখ্যান-লেখক ক্রমভঙ্গ ঘটান, কিন্তু তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড ব্যস্ততা ও তীব্রতার সঞ্চার করেন। অর্থাৎ সময়কে কীভাবে প্রবাহিত করবেন, তাকে কতটা গতি দেবেন ঘটনার সঙ্গে তার বুনোট ও বন্ধন ঘটিয়ে, তা অনেকটাই লেখকের উপর নির্ভর করে, সেটা তাঁর নির্বাচন। সাধারণ narrative বা আখ্যানকলার পাঠকদের দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত একটা সময়ের গতি আছে। আমরা সেটাকে বলতে চাই নিরপেক্ষ সময়। সেখানে লেখক যেন নিছক দ্রষ্টা, ঘটনা তার নিজের সম্ভাবনা ও গতিতে ঘটে যায়, তিনি তা-ই নথিভুক্ত করেন মাত্র। কিন্তু জেম্‌স জয়েস তা করেন না। তিনি সময় ও ঘটনার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে এমন একটা ধুন্ধুমার অবস্থা তৈরি করেন যে তাঁর হাতে সময়ের নিরপেক্ষ গতি আর বজায় থাকে না, তা 'নিয়ন্ত্রিত সময়' হয়ে দাঁড়ায়।

বলা বাহুল্য, ইতিহাস রচয়িতার হাতে সময়কে নিয়ন্ত্রণ করার এত বেশি ক্ষমতা থাকে না। তাঁকে একটি প্রলম্ব সময়ক্রম অনুসরণ করতে হয়। অবশ্যই তিনি একটি ঘটনার তাৎপর্য বোঝানোর জন্য নানা সমান্তরাল বা বিপরীত ঘটনার অবতারণা করতেই পারেন, তা পরের বা আগের ঘটনা হতেই পারে — আদালতে সওয়াল-জবাবে বা রায়ে precedence-এর মতো, কিন্তু তাঁকে মূল ও আলোচ্য বিষয়ের সময় সংগতি বজায় রাখতে হয়। কখনও শেষের ঘটনা শুরুতে এনে তিনি নাটকীয়তা যোগ করতেই পারেন — কিন্তু তখন তাঁর রচনা ইতিহাস ও সাহিত্য দুটি জগতেই পা রেখে চলতে চাইবে।

(খ) আখ্যানের অবয়ব

আখ্যানতত্ত্ব বা narratology নামক বিষয়টি নামে নতুন হলেও আসলে খুব নতুন নয়, তার সূত্রপাত অ্যারিস্টটলেই ঘটেছে বলা যায়। আমাদের নাট্যশাস্ত্রেও তার বীজ আমরা লক্ষ করি। ইতিহাস আর সাহিত্যের আখ্যানতত্ত্ব যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের তা বলাই বাহুল্য। ইতিহাসে আখ্যানটি প্রলম্ব, তার কালক্রমিক সংগঠনের উপর খুব বেশি হেরফের ঘটানো ইতিহাসকারের এক্তিয়ার বহির্ভূত।

এখানে 'ইতিহাস' কথাটির ব্যবহারে দ্ব্যর্থকতা সম্বন্ধে আমরা যেন একটু সতর্ক হই। যা ছিল — অর্থাৎ 'ইতি হ আস' — তাই কি ইতিহাস, নাকি যা ছিল তার বিবৃতি বা narration ইতিহাস? হয়তো দুই-ই, কারণ আবার কোশাম্বির ইতিহাসের সংজ্ঞা স্মরণ করি। তিনি বলেন, "...history is the development in chronological order of basic changes in the means and relations of production." (Kosambi, 1955 / Chattopadhyay, 2002 : 794)। এখানে ইতিহাস কথাটির অর্থ — যা ঘটে চলে। কিন্তু আমরা এ কথাটির যে অর্থে আলোচনা

করছি তা কিন্তু ভাষানিবদ্ধ[৪] আখ্যানমাত্র, অতীত ঘটনা ও জীবনের ভাষাবিবৃতি। ইতিহাস কথাটির আরও অর্থ অভিধানে আছে, আমাদের এখন তার মধ্যে যাবার দরকার নেই। কিন্তু এখানে আমরা এবং আমার ইতিহাসবিদ বন্ধুরা সম্ভবত এই বিশ্বাসই পোষণ করি যে, যে-অতীত কথা বলে না সে অতীত ইতিহাস-পদবি পাবার অধিকারী হয়নি। কথারূপ হওয়ার সূত্রেই সাহিত্য ও ইতিহাসের যোগ।

দুটিই কথাতে আশ্রিত বা কথাতে পরিবেশিত বিদ্যাক্ষেত্র, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু কথাতে যা পরিবেশিত হয়, তার মধ্যে যা আখ্যানধর্মী রচনা — তার একটি শারীরিক অবয়ব থাকে। এই অবয়বটি তৈরি হয় অবয়বের প্রত্যঙ্গগুলি কীভাবে সাজানো হচ্ছে তার ভিত্তিতে। এক দিকে ইতিহাস, অন্যদিকে আখ্যানবদ্ধ সমস্ত সাহিত্যকর্ম — মহাকাব্য, গাথা, লোককথা রূপকথা, গল্প উপন্যাস, নাটক — সমস্ত কিছুতেই ঘটনাকে কোনো-একটা বিন্যাসের অধীন করতে হয়।

এই বিন্যাসে ইতিহাসবিদের নিয়ন্ত্রণ যে সীমাবদ্ধ তা আমরা দেখেছি, কালের ক্রম মাত্রাটি তাঁকে মোটামুটি যেনে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, গল্প-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদিতে ঘটনার নিপুণ বিন্যাস করে শেষে যে একটি চমকপ্রদ উপসংহার তৈরি করা সাহিত্যকর্মীর অধিকার, নিছক ইতিহাসকারের সে-অধিকার নেই। অর্থাৎ ইতিহাসকার কল্পনা ও বিন্যাসকৌশলের সাহায্যে কোনো mythos বা প্লট তৈরি করতে পারেন না, যাতে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ঘটনা ঘটতে ঘটতে একটা কোনো আবেগঘন পরিণতিতে পৌঁছোতে পারে। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক নাটক উপন্যাস মহাকাব্য ইত্যাদির তুলনা করলেই পাঠক দুয়ের অবয়ব-পরিকল্পনার তফাত বুঝতে পারবেন। আরিস্তোত্‌ল Mythos বা প্লটের সংজ্ঞা দিয়েছেন '...the structure of the incidents.' (Butcher, 1961 : 62)। এই structure-এ ইতিহাসকারের চেয়ে নাটককার বা ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতা অনেক বেশি — কারণ তাঁর বেশিরভাগ কাজ কল্পনা নিয়ে, বাস্তব ঘটনার সঙ্গেও কল্পনা মেশালে তাঁকে কেউ আসামি করবে না।

এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ গ্রিক রাজা আত্রেয়ুসের বংশ সংক্রান্ত লোকপুরাণ, যার অন্তর্গত অয়দিপৌসের আখ্যান। কেউ যদি রবার্ট গ্রেভ্‌স সংকলিত পেলিক্যান সিরিজের গ্রিক পুরাণকথা থেকে গল্পটি পড়েন তাহলে দেখবেন সেখানে তা নিছক কালানুক্রমে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে কোনো প্রবল নাটকীয়তা বা বৃহৎ মানবিক বেদনা ফুটে ওঠেনি। তা নিছকই একটি ভয়ংকর আখ্যান। তাতে প্রথম থেকেই সকলে জানে যে, দেবতারা লাইয়ুসকে সাবধান করেছিল পুত্রসন্তান হলে তারই হাতে সে মারা পড়বে। রাজা চায়নি সন্তান। কিন্তু রানি ইয়োকাস্তা ছলনা করে তাকে উপগত হতে বাধ্য করে এবং যথাসময়ে অয়দিপৌসের জন্ম দেয়। তার পরের গল্প সকলেরই জানা।

কিন্তু সোফোক্লেস যখন এই ঘটনা নিয়ে নাটক লিখছেন তখন তাঁর কৌশলটা লক্ষ করুন। নাটকের প্রথম দৃশ্যে গ্রিক নাগরিকদের একটি দল, নাটকের ভাষায় যার নাম খরস্, তারা এসেছে রাজার কাছে অভিযোগ করতে, থেবেস নগরীতে নানা

দুর্গতি- লক্ষণ দেখা যাচ্ছে — অজন্মাও — রাজাকে তার প্রতিবিধান করতে হবে। রাজা অয়দিপৌসও রাজ্যেশ্বরের পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে খরস্-কে আশ্বাস দিচ্ছেন। যার পাপে এ সমস্ত ঘটছে তাকে তিনি অবশ্যই খুঁজে বার করবেন এবং তাকে ভয়ংকর শাস্তি দিয়ে রাজ্যে সুখসমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনবেন।

আমরা জানি যে, পরে তা ভয়ংকরভাবে উন্মোচন করবেন বলেই নাটকের শুরুতে অয়দিপৌসের অবাঞ্ছিত জন্ম, শৈশবে মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ, পাশের রাজ্যের রাজার সন্তান হিসেবে যৌবনপ্রাপ্তি, থেবেসের পথে নিজের পিতা লাইয়ুসকে হত্যা, স্ফিংসের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থেবেসে-র রাজা হওয়া এবং না জেনে নিজের মা ইয়োকাস্তাকে বিয়ে করা এবং তার গর্ভে সন্তানের জন্মদান — এই সমস্ত পূর্ব ঘটনাকে সোফোক্লেস সম্পূর্ণ গোপন রেখেছেন। নাটক যত এগোচ্ছে নাট্যকার তত সেই প্রচ্ছন্ন অতীতকে একে-একে উন্মোচন বা anagnorisis এবং peripetaia বা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তুলে আনছেন, বোঝা যাচ্ছে যে যে-মহাপাপীকে সন্ধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অয়দিপৌস, তা সে নিজে। এইভাবে ঘটনাকে আড়াল করার কিংবা আগে-পিছনে করার স্বাধীনতা, কখনও বড়ো ঘটনাকে ছোটো বা ছোটো ঘটনাকে বড়ো করার, কখনও ঘটনা বর্জন কখনও বা কল্পিত ঘটনা যোগ করার স্বাধীনতা ইতিহাসকারের নেই বললেই চলে।

অবশ্যই অনেক সাহিত্যকার প্লট সৃষ্টির মধ্যে একটা কৃত্রিমতা লক্ষ করেন, তাঁরা দাবি করেন যে, না, অব্যাহত জীবনপ্রবাহ থেকে তারা একটা অংশ আলাদা করে দেখাচ্ছেন মাত্র। বাস্তববাদ (realism) ও স্বভাববাদের (naturalism) প্রভাবে প্লটের বিষয়টা নিয়ে লেখকেরা একটু অস্বস্তি বোধ করেন, তাঁদের মতে slice of life কোনো কৃত্রিম প্লট-বিন্যাসের প্রতীক্ষা করে না। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর *পারাবত* গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পের একটি ভূমিকা করেছিলেন অনেকটা এইভাবে : জীবন যেন একটা নানা নকশার বহুবর্ণ কাপড়, কল থেকে অনন্ত থানের মতো বেরিয়ে আসছে। লেখকের কাজ আর কিছুই না, কাঁচি দিয়ে যে-কোনো দুটি প্রান্ত কেটে নেওয়া, তাই হল গল্প। এতে স্পষ্টতই আরিস্তোত্‌লীয় আদি মধ্য ও অন্তের সাজানো সংগঠন অস্বীকার করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ খানিকটা অত্যুক্তি বা অতি-সরলীকরণ। তার কারণ ব্যাপারটা যে এভাবে ঘটে না, লেখকের দায় থাকে বাস্তব হোক, কল্পিত হোক, ঘটনাকে একটা কোনো শৃঙ্খলা ও সংগঠন দেওয়া। বাস্তববাদের প্ররোচনাতেই এ ধরনের কথা উচ্চারিত হয়, কিন্তু লেখকেরা এগুলি হুবহু মেনে চলেন তা প্রায় কখনোই ঘটে না।

(গ) 'সত্য' ও কল্পনা

তবু যে ইতিহাস ইতিহাস এবং সাহিত্য সাহিত্য হিসেবে আলাদা হয়ে থাকে তার কারণ ইতিহাস মূলত ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে লিপ্ত থাকে, আর সাহিত্য মূলত কল্পনার সৃষ্টি, যদিও কল্পনার ভিত্তিতে ঘটনা থাকতেই পারে। 'সাহিত্যের সত্য', বলে

Scanned by CamScanner

একটা কথা আছে, সেটাকে ইতিহাসের 'সত্যে'র সমগোত্রীয় বলা যায় না। কেন যায় না, তা আমরা একটু পরেই দেখব।

ইতিহাসের সত্য অতীতে আশ্রিত, অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলে গৃহীত বা প্রমাণিত। কিন্তু শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হয় না। এই সত্যের ব্যাপ্তি, ব্যবহার্যতা ও চরিত্র নিয়ে সমস্যা সংকট তৈরি হতেই থাকে। সত্য যে বহুলাংশে আপেক্ষিক — আধুনিক পৃথিবীর এই ধারণা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জেগে উঠেছে, কোন্ পক্ষের সত্য? কোন্ শ্রেণির সত্য? কোন্ গোষ্ঠীর সত্য? কোন্ সময়ের সত্য? কোন্ ব্যবস্থার সত্য? বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে (চট্টোপাধ্যায়/বাগল, ১৩৬১ : ৩৩৭) যে নীতিগল্পটি তুলেছেন তা সকলেরই মনে পড়বে। চিড়িয়াখানার সিংহকে দেখানো হল একটি মানুষ মৃত সিংহের গায়ে জুতো মারছে। সেটা দেখে সিংহ বলল, 'মনুষ্যরচিত চিত্র' এমন হওয়ারই কথা। তবে 'সিংহরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত।'

নানা গোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে শুধু জীবনাচার ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ফলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে উপলব্ধ সত্যের পার্থক্য হয় তা নয়, কখনও কখনও দুটি গোষ্ঠীতে ক্ষমতানির্ভর প্রভুত্ব ও অধীনতার, কখনও বা পরস্পর-বিধ্বংসী শত্রুতার, সম্পর্কও গড়ে ওঠে, ফলে সাম্রাজ্যবাদীর লেখা কলোনির ইতিহাস আর উপনিবিষ্টের লেখা সেই ইতিহাস, বিপ্লবীর লেখা বিপ্লবের আর বিপ্লবের শত্রুদের লেখা বিপ্লবের ইতিহাস, সাদার লেখা ইতিহাস আর কালোর লেখা ইতিহাস, পাশ্চাত্যের লেখা প্রাচ্যের ইতিহাস আর প্রাচ্যের লেখা নিজস্ব ইতিহাস (এডোয়াড সাইদ দ্র.), ব্রাহ্মণের ও উঁচুজাতের লেখা ইতিহাস ও দলিতের লেখা ইতিহাস, পুরুষের অথবা নারীর লেখা ইতিহাস-এ দুয়ের মধ্যে অনেক সময় সত্যের তফাত হয়। শুধু ইতিহাসে কেন, নৃবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানেও তফাত হয়। এমনকি যা নিছক বিজ্ঞান তার চর্চা, গবেষণা এবং প্রয়োগে শ্রেণি ও শক্তির রাজনীতি-অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ যে থাকে তা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই।

ইতিহাসচর্চায় এটা দীর্ঘদিন লক্ষ করা গেছে যে, রাজরাজড়া সেনাপতির দল ইতিহাসবিদ্যার কেন্দ্রীয় মঞ্চ অনেক দিন দখল করে থেকেছে। মনে করা হত, তারাই যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজের বৃহৎ বৃহৎ পরিবর্তন ঘটাত, তারাই ইতিহাসের মূল বিষয় হবে। এক সময় সাহিত্যেরও উপজীব্য ছিল এইসব বীর ও রাজারাজড়ার দল, যেন তারা রূপকথারই ঐতিহাসিক সংস্করণ। এক সময় এ নিয়ে প্রশ্ন উঠল। বস্তুতপক্ষে সাবঅলটার্ন ইতিহাসবীক্ষণের হাতে কলমে সূত্রপাত হওয়ার অনেক আগে থেকেই এ প্রশ্ন উঠে পড়েছে। সেই ১৯০৪-এই রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে লিখেছিলেন—

"সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদবুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরীরক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনে

নিস্তব্ধ মৌন — এ সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী?"

রবীন্দ্রনাথ ভারতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রশাসনের বদলে সমাজকে বেশি মূল্যবান বলে মনে করেছেন, এবং টয়েনবির সেই 'সোসাইটি'-র ধারণায় এই অন্তরালবর্তী লোকসমাজের কথা, এমনকি ইতিহাস-অতিক্রমী সেই সব মানুষের কথা হয়তো এসে পড়ে — যারা 'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে' কাজ করে চলেছে।

জানি না সমাজের সবটা সত্য এক সঙ্গে ধরা যায় কি না। ভিক্টোরীয় যুগের একটা প্রকাশ্য ও সরল সত্য ছিল তার নীতিবাগীশ সুরুচির আড়ম্বর, অন্য একটা তলবর্তী সত্য ছিল *Pearl* ম্যাগাজিনে বর্ণিত বীভৎস ও লাগামহীন যৌনতার ছবি। গ্যয়টে ও অন্যান্যরা ক্লাসিক্যাল যুগের গ্রিকদের সম্বন্ধে স্থিতি, সৌষম্য, বীর্যবত্তা ও সংযমের যে-একটি স্থিরচিত্র তৈরি করেছিলেন, E.R. Dodds তাঁর *The Greeks and the Irrational* বইয়ে তার প্রায় বিপরীত একটি ছবি দেখান আমাদের (Dodds, 1951)। সমস্ত শ্রেণির, সমস্ত পক্ষের, সমস্ত স্তরের সত্যের সমন্বয় করা সহজ না কঠিন তা ইতিহাসবিদ বন্ধুগণ আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবেন।

কিন্তু ইতিহাসের একটা সুবিধে এই যে, তার উপর কারও একচ্ছত্র মালিকানা নেই। তা সাম্রাজ্যবাদীর ইতিহাস হোক, শাসক ও বা শোষক শ্রেণির তৈরি ইতিহাস হোক, তা যেহেতু এক সার্বজনিক বিবৃতি, তার প্রতিবাদ, সংশোধন, সংযোজন, বর্জন, পরিবর্তন — সবই হতে পারে, অন্যদের হাতে। কারণ ইতিহাস যেন একটি সংলাপ বা ডায়ালগ্ — যা একাধিক মানুষের মধ্যে অনবরত চলতে থাকে। ট্রট্‌স্কির (ত্রৎস্কি) রুশ বিপ্লবের ইতিহাস গ্রন্থের ম্যাক্স ইস্টম্যান-কৃত ইংরেজি অনুবাদের সম্পাদক F.W. Dupee তাঁর ভূমিকায় (Trotsky, 1959; viii) যেমন বলছেন, Trotsky's historical theses are challenged, his judgement of other leaders intransigent, we are all the more free to accept, reject, or modify his ideas because he presents them with such proud and lucid candour."

পরিবেশনে proud and lucid candour থাকুক আর নাই থাকুক, ইতিহাস যেহেতু একটি public statement, এবং তার জন্য তথ্য, প্রমাণ, সাক্ষ্য, যুক্তি ইত্যাদির সমর্থন দরকার, তখন যতক্ষণ না তার বস্তুগত ও যুক্তির ভিত্তি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ থাকবে ততক্ষণ তার সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকবেই। ফলে ইতিহাসের সংশোধন ও পরিবর্তন হতেই থাকে, কোনো ইতিহাস সম্বন্ধেই বোধ হয় শেষ কথা বলা যায় না। বিজ্ঞানের তত্ত্বপ্রতিষ্ঠায় অপ্রমাণযোগ্যতা বা falsifiability-তে যে শর্ত থাকে, ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সেই শর্ত বহাল থাকে। তাতেই ইতিহাস একটি বিশ্বাস্যতার ভিত্তি অর্জন করে। সাহিত্য প্রামাণ্যতা-অপ্রামাণ্যতার বাইরে থেকে যায়।

সাহিত্যের যে-কোনো রচনা একটি unique বা অনন্য সৃষ্টি — তাকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারি কিন্তু তাকে সংশোধন বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা বা অধিকার

Scanned by CamScanner

কারও নেই। অবশ্যই মুদ্রণের আগের যুগে পাণ্ডুলিপিতে পুঁথি-নকলকারীরা প্রচুর পরিবর্তন করেছে, মুদ্রণের পরেও পরিবর্তন পরিবর্জন ঘটেনি তা নয়।[৫] কিন্তু আধুনিক কালে লেখকের রচনা বা শিল্পীর সৃষ্টিতে এই unique লক্ষণই মূলত গৃহীত, এবং তারই ফলে ধনতন্ত্রে শিল্পকর্ম বা সাহিত্যকর্মের মূল্য নির্ধারিত হয়, কোনো নাম বা কোনো স্বাক্ষর ব্র্যান্ড হয়ে ওঠে। বীতাধুনিক যুগে এই uniqueness অস্বীকার করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, উত্তর-অবয়ববাদী রল্যাঁ বার্তে গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এমনকি লেখকের মৃত্যুও ঘোষণা করেন (দ্র. Barthes, 1989 : 49-55)।[৬] কিন্তু এসব হট্টগোল সত্ত্বেও ইতিহাস কখনোই সে অর্থে নিছক ব্যক্তিগত প্রকাশ হবে না, সাহিত্য হবে না পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টি। ফলে সত্যের সন্ধানে ইতিহাসের শরীরে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অদলবদল চলবেই। কিন্তু সাহিত্য-রচনা আমরা পছন্দ করতে পারি, এমনকি বীভৎস বা সর্বনাশা মনে করে সরকারি আদেশে তা নিষিদ্ধও করাতে পারি। কিন্তু তাকে পরিবর্তনের অধিকার লেখকের নিজের ছাড়া কারও নেই।

সাহিত্য যেহেতু মূলত কল্পনার সৃষ্টি, তার সত্য সম্বন্ধে কিছু বলা সহজ নয়। যদিও আরিস্তোত্‌ল বলেই দেন, Poetry, therefore, is a more Philosophical and higher thing than history : for poetry tends to express the Universal, history the particular (Butcher, 1961 : 68)। তবু সাহিত্য (আরিস্তোত্‌ল poetry বলতে মূলত তা-ই বোঝান) সমসাময়িক দেশকালের সত্যকে প্রকাশ করে না তা নয়। অবশ্যই এই সত্যের চরিত্র কিছুটা আলাদা। রবীন্দ্রনাথের 'তথ্য ও সত্য'-এর বিরোধ-কল্পনায় তার আংশিক ইঙ্গিত আছে কিন্তু সম্পূর্ণ বয়ান নেই। ইতিহাস অবশ্যই দেশ ও সমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু ঘটে গেছে তা নিঃসংশয়রূপে ঘটে গেছে বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, কিন্তু ইতিহাসও কেবল তথ্যমাত্রিক নয়। ইতিহাসের চরিত্র ও ঘটনাও কখনও কখনও মানবজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বৃহৎ রূপক হয়ে ওঠে, যে জন্য 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে' কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। যে জন্য রবার্ট ব্রুস আমাদের কাছে অধ্যবসায়ের উদাহরণ হয়ে থাকেন, রাজা ক্যানিউট বিচক্ষণতার, মহম্মদ তুঘলক খামখেয়ালের, আকবর ধর্মীয় উদারতার; প্লুতার্কের *Lives* বা হলিন্‌শেডের *ক্রনিক্‌ল* থেকে শেক্‌সপিয়ার এই কারণেই অসামান্য সব নাটক সৃষ্টি করেন। ইতিহাসের নির্দিষ্ট সত্য তখন চিরন্তন মানবসত্য হতে চায়।

অবশ্যই সাহিত্য সমসাময়িক, কখনও অতীত বা কল্পিত ভবিষ্যতের বাস্তবকে প্রতিফলন বা নির্মাণের কাজও করে, তার নিজস্ব গবেষণা ও কল্পনার দ্বারা যতটা সম্ভব। কিন্তু ইতিহাসের চেয়ে সাহিত্যের বড়ো দায়িত্ব হল ওই সময়ের একটা মনস্তাত্ত্বিক সত্যের নির্মাণ। অর্থাৎ মানব সম্পর্কের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষ কী চায়, এই চাওয়ার সংগতি অসংগতি সম্ভাবনা ও বিফলতা, নানা মূল্যবোধের ভাঙাগড়া তার অভিঘাত — তারই মধ্য দিয়ে স্থানকাল পাত্রকে পার

হয়ে যাওয়া এক সত্যের সন্ধান সাহিত্য করতে চায়। সে সত্য হয়তো তখন আর দেশকালে নিহিত বা সীমাবদ্ধ নয়, ব্যাপক এক মানবসত্য।

কখনও কখনও সাহিত্যের তথ্য নিয়ে বিবাদ হয় না তা নয়। কিন্তু সেটা অনেক সময় তার অন্তর্গত ইতিহাস-বস্তু বা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবাদ। আপনারা সকলেই জানেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) প্রকাশিত হওয়ার পর একটি গোষ্ঠী একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন মুসলমান রাজকন্যা আয়েষা হিন্দু রাজপুত্র জগৎসিংহকে উল্লেখ করে 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' বলায়। এর উত্তরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে কিংবা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঔপন্যাসিক ইসমাইল হোসেন শিরাজী *রায়নন্দিনী* বলে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, যাতে হিন্দু সামন্তভূপতির কন্যা মুসলমান রাজপুত্র বা সেনাধ্যক্ষের প্রেমে পড়েছিলেন। আমাদের মতে দুটিই খুব স্বাভাবিক এবং সংগত ঘটনা — কিন্তু ইসমাইল হোসেন শিরাজী রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও সমাজনীতিতে মুসলমানকন্যার হিন্দু যুবকের প্রতি প্রেম মেনে নিতে পারেননি। তাঁর বোধ হয় একথা জানা ছিল না যে, 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' প্রবাদের স্রষ্টা দারা শিকো-র সুহৃদ *রসগঙ্গাধর* প্রণেতা কাব্যশাস্ত্রী জগন্নাথ লবঙ্গী নামক মুসলমান-ললনাকে বিবাহ করে পরম সুখী ছিলেন ('যবনী রমণী বিপদঃ শমনী কমনীয়তমা নবনীতসমা') (দ্র. দাস, ১৯৯৪ : ২২) অন্যদিকে মুসলমান সম্রাটেরাও রাজপুত রমণীদের পরম সমাদরেই ভার্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

যাই হোক, শিরাজীর বিরোধ এ সব সত্য নিয়ে নয়, তথ্য নিয়ে, তথ্যকেই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায়। তথ্যের ভ্রান্তি দেখানো যেতেই পারে, সত্য হয়তো ভ্রম ও সংশোধনের ঊর্ধ্বে। ফলে *রায়নন্দিনী* *দুর্গেশনন্দিনীকে* বাতিল ও নাকচ করতে পারেনি, আবার *দুর্গেশনন্দিনীর*ও *রায়নন্দিনীকে* নাকচ ও বাতিল করার প্রশ্ন ওঠে না। দুটিই তার নিজস্বতা নিয়ে সাহিত্যে স্থান গ্রহণ করবে। শিল্পের বিচারে কার গ্রাহ্যতা কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে তা আমাদের বিচার্য নয়।

অন্তমন্তব্য

ইতিহাস বিজ্ঞানের সহচর, একাধিক অর্থে। প্রথমত ইতিহাস-প্রণয়নে একজন নয়, বহু মানুষের একটা নিরন্তর ভূমিকা থাকে। কোনো কোনো ইতিহাস-গ্রন্থ — মম্‌সেন, গিবন, টয়েনবির মতো মানুষের লেখা — লেখা ও শৈলীর গুণে ক্লাসিক হিসেবে গণ্য হতে পারে না তা নয়; কিন্তু তার তথ্যের ছোটবড় অংশ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে এবং পরবর্তী গবেষকরা তার সংশোধনে এগিয়ে আসেন। ফলে যতই ক্লাসিক হোক, ইতিহাস রচনা কখনও সম্পূর্ণ হয় না বলা চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা একটি যৌথ প্রয়াস। অন্যদিকে সাহিত্যের রচনাগুলির প্রত্যেকটিই পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উপস্থিত হয়। অবশ্যই লিখিত বা মুদ্রিত প্রকাশের আগে তাতেও নানা বর্জন ও সংযোজন ঘটে, তার ফলে দীর্ঘ কবিতা হ্রস্ব হয়, গদ্য কবিতা পদ্যের আশ্রয় পায়,

Scanned by CamScanner

পত্রিকায় প্রকাশ ও গ্রন্থাকারে প্রকাশে পাঠের তফাত হয় — কিন্তু এসব পরিবর্তন করেন একজন স্রষ্টা, ব্যক্তিগত কর্তা। একটি রচনাকেই, কখনও-বা একাধিক রূপান্তরকেও তিনি চূড়ান্ত সৃষ্টি বলে স্বীকৃতি দেন। ঐতিহাসিককে সে অর্থে স্রষ্টা বলা যায় না। না বলা গেলও তিনি আমাদের অতীতকে জীবন্ত ও যথার্থ করে আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন, Time Past-কে Time Present-এর সঙ্গে জুড়ে দেন, এবং এভাবে Time Future-কেও আভাসিত করেন। একটা দেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে সাহিত্য-শিল্পকলার পাশেই তার ইতিহাসের স্থান। তা সাহিত্য-শিল্পকলার উৎস ও আশ্রয়কে নির্দেশ করে, বৃহত্তর জীবনযাপনের সংস্কৃতির সঙ্গে তার অনিবার্য যোগসূত্রটি ধরিয়ে দেয়। ফলে ক্রোচের কথা এক অর্থে খুবই সত্য যে, 'All history is contemporary history'। অতীত আমাদের আত্মবোধের ও আত্মপরিচয়ের এক জরুরি উপাদান। সাহিত্য-সংস্কৃতিও তাই। পণ্ডিত নেহেরু এ কথাটিকেই তাঁর *Discovery of India*-তে বিশদ করে বলেছেন, 'If I felt occasionally that I belonged to the past, I felt also that the whole of the past belonged to me in the present. (Nehru, 1960 : 9)।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১। আমরা জানি যে, আধুনিকতা শেষ হয়ে উত্তর-আধুনিকতার সূত্রপাত হল — এ কথা অসংগত ঐতিহাসিক সরলীকরণ। তাই 'অগ্রবর্তী' কথাটি আপেক্ষিক অর্থে ধরতে হবে।

২। আধুনিক ভারতীয় ভাষার নানা সাহিত্যেও ঐতিহাসিক কবিতা নাটক ও উপন্যাস যে অতিশয় জনপ্রিয় সাহিত্যকর্ম — তা আশা করি বলার অপেক্ষা রাখে না। মারাঠিতে গুণাজিকার, গুজরাতিতে কে এম মুনশি, তামিলে *ক্লাসিক্স*-র লেখক এ মাধবিয়াহ্ ইত্যাদি নাম ইতস্তত মনে আসছে।

৩। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকেই বাংলায় এক ধরনের narrative present tense-এর ব্যবহার করেছেন। তাঁরা ক্রিয়াপদকে বর্তমানকালে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন —

'দেশের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ। যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, "কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয়নি।" কর্তা বলেন, "ওরে অবোধ, আমরা ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।"

তারা বলে, "ভয় করে যে কর্তা।"

কর্তা বলেন, "সেইখানেই তো ভূত।" '

'কর্তার ভূত', *লিপিকা*, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী। (২৬ শ খণ্ড, ১৩২ পৃ.)

৪। ভাষার সাহায্য ছাড়া ইতিহাসের বিবৃতি সম্ভব হতে পারে, তবে তা সহজসাধ্য নয়। চলচ্চিত্র, স্থিরচিত্রমালা, মূর্তিকলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে তুলে ধরা যেতেই পারে। কিন্তু লিখিত বা মৌখিক ভাষার সাহায্য ছাড়া সে সব প্রদর্শন পঙ্গু হতে বাধ্য।

৫। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ সম্পাদনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও

পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়া-মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি।" (চট্টোপাধ্যায়/বাগল, ১৩৬১ : ৮৫৪)। অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমগ্র সৃষ্টি আমরা আর পাই না। এখানে নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ইতিহাসবিদ বঙ্কিমচন্দ্রের পরাজয় ঘটেছে।

৬। অবশ্য বার্তে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তুলনা করে লেখার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত স্বরের অনুপস্থিতিকে তার মৃত্যু বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু সাহিত্যরচনার লেখাতেও স্রষ্টা লেখক যতটা উপস্থিত থাকেন ইতিহাসলেখনে তাঁর ততটাও উপস্থিত থাকার কথা নয়। বার্তে সে জন্য ইতিহাসের লেখককে অধিকতর মৃত বলে ঘোষণা করবেন কিনা জানি না।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (দ্র বাগল [সম্পা.], ১৩৬১)— 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (দ্র বাগল [সম্পা.] ১৩৬৩)

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৫, 'স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১২শ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৯৬১

— 'কর্তার ভূত', *লিপিকা*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ২৬ শ খণ্ড (বিশ্বভারতী সংস্করণ)

ত্রিপাঠী, অমলেশ, ১৯৮৬, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৮৯, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স

দাস করুণাসিন্ধু, ১৯৯৪, *কাব্যজিজ্ঞাসার রূপরেখা*, কলকাতা, রত্নাবলী

বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পা.), ১৩৬১, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড (সাহিত্য), কলকাতা, সাহিত্য সংসদ।

Barthes, Roland, 1989, *The Rustle of Language* (tr. Richard Howard), Berkely etc., University of California Press.

Butcher, S. H. (see Fergusson, 1961)

Chattopadhyay, Brajadulal (ed.), 2002, *Combined Method in Indology and other Writings of D. D. Koshambi*, New Delhi etc., Oxford University Press.

Dupee, F. W. (ed.), 1959 (see Trotsky).

Fergusson, Francis, 1961, *Aristotle's Poetics* (tr. by S. H. Butcher), New York, Hill and Wang.

Kerenyi, C., 1960, *The Heroes of Greece*, London, Grove Press.

Koshambi, D. D., 'The Historical Krishna' (See Chattopadhyay, 2002, 390-406).

—, 1955, 'What Constitutes India's History, (See Chattopadhyay, 2002, 194-201).

McNeill, W. H., 1963, *The Rise of the West*, Chicago, University of Chicago Press.

Muller, Herber J, 1954, *The Uses of History*, New York, Mentor Books.

Nehru, Jawaharlal, 1960, *The Discovery of India*, London, Meridian Books.

Toynbee, A, 1947, *A Study of History*, New York & London, Oxford University Press.

Scanned by CamScanner